পশ্চিম বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : পাঁচটি ব্লক

গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

গবেষক :

অমর কুমার সাহা

: গবেষণা নির্দেশক :

ড. বাণীরঞ্জন দে

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র:

■ **প্রথম অধ্যায়:**
এলাকার ভৌগোলিক পরিচিতি **১**

■ **দ্বিতীয় অধ্যায়:**
জনজাতি পরিচিতি **১৯**

■ **তৃতীয় অধ্যায়:** **৩২**
লোকসংস্কৃতির নানাদিক
পর্ব: ক : লোক উৎসব ও মেলা ৩৩
পর্ব: খ : লৌকিক দেবদেবী ৪৯
পর্ব: গ : লোকাচার ৭০
পর্ব : ঘ : লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ৮২
পর্ব : ঙ : লোকক্রীড়া ৯৪
পর্ব : চ : লোকশিল্প ১০৫
পর্ব : ছ : লোকনৃত্য ১১৮
পর্ব : জ : লোকচিকিৎসা ১২৫

■ **চতুর্থ অধ্যায়:** **১৩৫**
লোকসাহিত্য
পর্ব : ক : ছড়া ১৩৭
পর্ব : খ : ধাঁধা ১৫৮
পর্ব : গ : প্রবাদ ১৮৮
পর্ব : ঘ : ব্রত কথা ২১৮
পর্ব : ঙ : লোকপুরাণ ২২৮
পর্ব : চ : শিকার কাহিনি ২৩৫
পর্ব : ছ : লোকগীতি ২৪২

■ **পঞ্চম অধ্যায়:**
লোকভাষা **২৮৩**

■ **ষষ্ঠ অধ্যায় :**
শেষ কথা **৩০৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত মেদিনীপুর মহকুমার চারটি ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার একটি ব্লকের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য পর্যালোচনা বর্তমান গবেষকের গবেষণার বিষয়। তদানুসারে এখানকার লোকজীবনের সুবিস্তৃত পর্যালোচনা করা, লোকজীবনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অন্তর্গত এলাকার জনজীবন কৃষি ও বনজ সম্পদে ঘেরা। কৃষি এখানকার প্রধান উপজীবিকা আর মানুষ ও জঙ্গল আছে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে । লালকাঁকুরে ল্যাটেরাইট মাটির দেশ এই অরণ্যভূমি এলাকায় মহুয়া ফুলের মাদকতা, শালফুলের সুবাস জঙ্গলময় লোকায়ত জীবনধারাকে মধুময় করে তুলেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গবেষণার প্রস্তাবিত অঞ্চলটি তপশিলি জাতি ও আদিবাসী জনজাতিতে ভরা। সাঁওতাল মুণ্ডা শবর জেলে কুরমি বাগদি ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির বাস বেশি। সেইসঙ্গে বর্ণহিন্দুরাও বসবাস করে। জনজাতিদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ছন্দ, ঘরদোর বাঁধানোর রীতি সাজসজ্জা ক্রিয়াকর্ম ধর্মবিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠানের এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এইসব দিক তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায় : এলাকার ভৌগোলিক পরিচিতি

প্রস্তাবিত এলাকার ভূ-প্রকৃতি তরঙ্গায়িত ছোটোনাগপুর মালভূমি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এখানে সেখানে ডুঙ্গি বা টিলা দেখা যায়। এ-বিষয়ে সুবিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এলাকার জলবায়ু খনিজ সম্পদ নদনদী বিষয়ে পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্লকের জলসেচ ব্যবস্থা কীভাবে হয় তার বিবরণ বনভূমি থেকে প্রাপ্ত বনজ সম্পদ সম্পর্কে পর্যালোচনা, গবেষণা অঞ্চলটির যোগাযোগ মাধ্যম কী ও কীভাবে করা হয় তার সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। দর্শনীয় স্থান, প্রতিটি ব্লকের প্রতি গ্রামের নাম ও গ্রাম নামের উৎসকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন স্থান নামগুলির সঙ্গে শোল, ডাঙ্গা ডিহি বন প্রভৃতি নামযুক্ত গ্রামনাম সংখ্যা খুব বেশি। এর থেকেই ধারণা জন্মে যে এলাকাটি ছোটোনাগপুর পার্বত্যভূমি অঞ্চলের। প্রত্ন-প্রস্তর বলয় ও গাঙ্গেয় বলয়, কোলীয় ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী ও বাংলাভাষী আর্য-অনার্য মিশ্র জনগোষ্ঠী পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জনজাতি পরিচিতি

এই অধ্যায়ে সুবিস্তৃতভাবে জনজাতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যা, তথ্য, নারী-পুরুষ অনুপাত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, তফশিলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা উল্লিখিত। বর্গাদারের সংখ্যা, প্রান্তিক চাষি, কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ব্লক অনুসারে বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। জনজাতির খাদ্য ও পোশাক, ভাষাবৈচিত্র্য ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন গণ আন্দোলন যেমন চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, লায়েক হাঙ্গামা প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঁচটি ব্লকের জনগোষ্ঠীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মুণ্ডা, সাঁওতাল মাহালি, কোডা, কুরমি প্রভৃতি জনজাতির বিশেষ আলোচনা আছে।

তৃতীয় অধ্যায় : লোকসংস্কৃতির নানাদিক

ক. লোকউৎসব ও মেলা ।।

জঙ্গলমহলে উৎসব অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হোল, সামাজিক গোষ্ঠী জীবনের সংহতি বজায় রাখা। পৌষ পার্বন ও সেই উপলক্ষে বিভিন্ন লোকমেলার সৃষ্টি। পৌষ-পার্বণ বাঙালির অন্যতম শস্য উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে তামিলনাড়ুর 'পোঙ্গল' উৎসবের মিল রয়েছে । পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে লক্ষ্মী পুজোয় একটি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে 'এই খ্যান' বা 'এখ্যান' উৎসবটিও আলাদা মর্যাদা পায়।

টুসু উৎসবে বিশেষ লোকদেবী টুসু দেবীর পরিবর্তে স্নেহের পুত্তলি কন্যারূপে সমাদৃত। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকেই সাঁওতাল ভূমিজ ভুঁইয়া কুরমি মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষ টুসু উৎসব শুরু করে দেয়। টুসু উৎসব ধরিত্রীর কল্যাণী ও সুশ্রী রূপের পুর্নজীবন কামনার অভিব্যক্তি। গ্রিসের 'গার্ডেন অব অ্যাডোনিস' নামে যে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় তার সঙ্গে এই অঞ্চলের টুসু উৎসবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

বাঁকুড়া ঘেঁষা অঞ্চলটিতে ভাদু উৎসব টুসু উৎসবের মতোই জনপ্রিয়। ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদু উৎসব পালিত হয়। ভাদু যেন ঘরের কন্যা। অরণ্য আশ্রিত আদিবাসী সাঁওতাল মুণ্ডা ভূমিজদের উৎসব নয় — এ উৎসব হোল হিন্দুসমাজভুক্ত অন্ত্যজ উপজাতির। সাধারণত বাগদি বাউরিরা এই উৎসব পালন করে। এই নাচগানের উৎসব একমাস ধরে চলে। ভাদু গানের মাধ্যমে কুমারীর যন্ত্রণা, শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা সামাজিক কু-আচার ইত্যাদি থাকে।

কুরমি সম্প্রদায়ের মানুষের 'জাওয়া উৎসব' এক বিশেষ উৎসব। এই উৎসবে কিশোর-কিশোরীরা পরস্পরকে কোমর ধরে যূথবদ্ধ নাচ-গানে অংশগ্রহণ করে। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে করম উৎসব পালিত হয়। পলি-আবৃত সমভূমিতে করম উৎসব শস্য উৎসবে পরিণত হলেও অরণ্যাশ্রিত ভূমিতে করম উৎসবের প্রকৃতি বদলে যায় শিকার-আঙ্গিকে। বিনপুর-১ (লালগড়) ও গড়বেতা - ৩ (চন্দ্রকোনারোড) ব্লকে এইদিনই ইঁদপরব। এই উৎসবে শস্য ও সন্তান কামনায় উদ্ভিদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জাদুক্রিয়া মিশ্রিত আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত।

অরণ্যচারী আদিম আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোডা প্রভৃতি মূল জনজাতির প্রধান দেবতা বড়াম - যার অবস্থান

শালগাছের তলায় এক একটি অখোদিত বড়ো পাথরকে কেন্দ্র করে। এখানে বড়াম দেবতা ছাড়া অন্য দেবতা আছে। যেমন - মারাং, বুরুং, বোঙা, জাহের আরা প্রভৃতি। বড়ামের রূপান্তরিত নাম 'গরাম'। হিন্দু ধর্মাশ্রিত জাতি উপজাতি জনগোষ্ঠী মাহাতো কুরমি লোধা শবর ভূমিজ ভুঁইয়া মাঝি দুলে বাগদি প্রভৃতির পাশাপাশি সাঁওতাল মুণ্ডা কোড়া প্রভৃতি। গ্রামের প্রবেশপথে কিংবা গ্রামের একপ্রান্তে কোনও বড়ো গাছের তলায় এর পুজো করে।

এই অঞ্চলের আদিবাসীদের আর একটি উৎসব বাঁধনাপরব। গবাদি পশুর উৎসব। কার্তিকমাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপুজোর দিন এই উৎসব শুরু হলেও এর পূর্বপ্রস্তুতি চলে একমাস আগে থেকেই। বাঁধনা পরব প্রকৃতপক্ষে গো-মহিষের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন গো-বন্দনা। বাঁধনা পরব উপলক্ষে যেসব গান-গাওয়া হয় তার শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ধাঙড়দের অসংবৃত ও শ্লীলতাহীন নাচে গ্রামের কুলি (রাস্তা) চঞ্চল হয়ে ওঠে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এলাকার 'মাছি খেদা উৎসব' ও 'আঁশ পোড়ান' নামক লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'মাছি খেদা' উৎসব গ্রাম থেকে অশুভশক্তি ও অপদেবতা বিতাড়নের আদিবাসী আচার। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এখানকার সামাজিক ইতিহাসে শিব উৎসব ও এ উপলক্ষে মেলার এবং গাজনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। চড়ক ও গাজনের বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের পুজো উপলক্ষে ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে মেতে ওঠে। জলহরি গ্রামে কোনও ডোমজাতির লোক বাস না করলেও ধর্মঠাকুরের পুজোয় সারাদিন মত্ত থাকে। এখানে রথযাত্রা মেলা, রাসযাত্রা, ঝুলন, দোলযাত্রা, ভীমপুজো আকর্ষণীয় উৎসব। এ বিষয়ে তথ্যসহ আলোচনা করা হয়েছে। এই এলাকাটির বিভিন্ন প্রান্তে ভীমপুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হলেও শালবনি ব্লকের বিষ্ণুপুরের মেলা খুব বড়ো এবং তিনচারদিন ধরে হয়। এ বিষয়ে তথ্যালোচনা আছে।

খ. লৌকিক দেবদেবী

শাস্ত্র অননুমোদিত অর্থাৎ লোকদেবতার সংখ্যা অনেক। লৌকিক দেবদেবীর পুজোর কারণ বন্য পশুর আক্রমণ, রোগ মহামারীর সংক্রমণ থেকে রক্ষা, বন্ধ্যাত্বমোচন, শস্যবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থাগম প্রভৃতি কামনা। বনের ভেতরে, ঝর্ণার ধারে, টিলার গায়ে শাল গামার প্রভৃতি গাছের তলায় লোকদেবতার জন্ম। প্রকৃতি-পরিবেশে যেখানে বিস্ময়ের অবকাশ রয়েছে সেখানেই আসন পেতেছে লৌকিক দেবদেবী। এই এলাকাটিতে 'সিনি' দেবতা শিব শীতলা মনসা চণ্ডীর মতই গ্রামে-গঞ্জে, বনে-বাদাড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে-ঘাটে, ডাঙা-ডিহিতে রয়েছেন। 'সিনি' দেবতা গ্রাম দেবতা এবং গ্রামনামের সঙ্গে 'সিনি' শব্দ যোগ করে বেশিরভাগ সিনি দেবতার নামকরণ করা হয়েছে। সাতবইনী দেবতা ও এখানকার এক বিশেষ লোকদেবতা। ভাউদি গ্রামের সাতবইনী দেবতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া গরাম দেবতা, বিশেষত গদামৌলির পুটুবুড়া দেবতার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ওলাইচণ্ডী, ঘাঁটু দেবতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জঙ্গলমহলে কুদরা দেবতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের কুদরা দেবতা রয়েছেন, পথকুদরা, ধনকুদরা, শিশুকুদরা প্রভৃতি। কুদরা দেবতার থান বা স্থান নির্দিষ্ট হলে তাকে থাপন কুদরা বলে। কুদরা প্রকৃতপক্ষে অপদেবতা, এক শ্রেণির ভূত। H.H.Risley বলেছেন : 'Kudra and Bisapachandi are milignant ghost of Canmibalistic Propensities.' [H.H. Risley - Tribes and Castes of Bengal - 1891] দ্রাবিড় ভাষা বংশের শব্দ 'কুদিরৌ' (Kudirai) -এর অর্থ ঘোড়া। অনেকের ধারণা কুদরার আকৃতি ঘোড়ার মতো। দক্ষিণ বর্ধমানে কুদরা মানে নোংরা। আবার দক্ষিণ বাঁকুড়াতে ভয়ানক বা কুশ্রী বা অশালীন অর্থে কুদরা শব্দের ব্যবহার শোনা যায়। বাঁকুড়া সীমান্তবর্তী গোয়ালতোড় ব্লকের (গড়বেতা-৩) গ্রামগুলিতে এসব কথা প্রচলিত আছে - 'লোকটা কুদরার মতো দেখতে' (খুব কালো হলে গায়ের রঙ), 'তোর কুদরা গিরি ছাঁড়াই দিব'।

গ. লোকাচার

এলাকার লোকাচারগুলি বেশি পালিত হয় সন্তান গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এছাড়া উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লোকাচার পালিত। যেমন যজ্ঞের হোমের সময় নতুন পোশাকে মোড়া যে পাকা কলাটি ঘিয়ে পোড়ানো হয় সেই পোড়া কলাটি গর্ভবতী মাকে তিন বা ছয় মাসে খাওয়ানোর প্রথা রয়েছে। ওই কলা খেলে গর্ভবতী মা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় বলে লোকসমাজে বিশ্বাস করে। এই কারণে কোনও কোনও বাড়িতে গর্ভবতী মহিলা থাকলে তিন বা ছয়মাসের মাথায় যজ্ঞের বা হোমের আয়োজন করা হয়।

ভবিষ্যপুরাণে বেলগাছকে রাঢ়ের জঙ্গলময় দেশে আবাস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই এলাকায় অসংখ্য বেলগাছ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা একে মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করে। শিবপুজোয় বেলপাতা আবশ্যক। গাজনের সময় ভক্তাদের বেলফল খাওয়া ভক্ষ্যবিধি। ১০৮টি বেলপাতা দিয়ে বাড়িতে হোম বা যজ্ঞ করার রীতি প্রচলিত। বিভিন্ন শ্রেণির বৃক্ষপুজো উর্বরতাশক্তি ও প্রজননশক্তির আচার, পুজো। এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ. লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকাচারের মতো লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার নিরক্ষর গ্রামীণ লোকমানসে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। লোক-বিশ্বাসের উদ্ভব আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষের ভয়-ভীতি, শোক-জ্বালা, রোগ-যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ অনুসন্ধান থেকে। মনস্তাত্ত্বিকগণ মনে করেন বিশ্বাস-সংস্কারের মূলে মানুষের মানসিক গঠনই কাজ করে। সংস্কারের মূলে মানুষের অসচেতন মানসিকতাই দায়ী। বর্তমানে জঙ্গলমহলের পাঁচটি ব্লকের কোনও কোনও এলাকা শহরাঞ্চলে পরিণত হওয়ায় ও শিক্ষার হার বাড়ায় এখানে সংস্কার ও বিশ্বাস কিছু কিছু লোপ পেয়েছে। তবুও অদ্ভুত সব লোকবিশ্বাস -সংস্কার এখনো আছে। যেমন, শিশুর বুকে

থুতুর ফোঁটা মা লাগিয়ে দেয়। শিশুকে এঁটো করে দেওয়ায় কেউ কু-নজর দিতে পারে না।

ঙ. লোকক্রীড়া

বিভিন্ন লোকক্রীড়া বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বাঘ-ছাগল, ঘরকাটাকাটি, পাতাহুশহুশ, কানামাছি , আড়াঘোড়া, ফুলফুল, কুস্তি, নারকেলদখল, জলকুমির , ডাংগুলি, রামদেড়া, কিৎকিৎ, লাঠিখেলা, ষোলোঘুঁটি, বাঘবন্দি, আগডুম বাগডুম, গাছগাছ প্রভৃতি খেলার খোঁজ মেলে। খেলার সঙ্গে ছড়ার যে যোগ রয়েছে কুমির কুমির, আড়াঘোড়া, ঢারে মশা প্রভৃতি খেলায় তা লক্ষণীয়। আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের মানসিক শারীরিক ও জৈবিক গঠনে লোকক্রীড়াগুলির গুরুত্ব অনেক। জঙ্গলমহল এলাকায় শিকার ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তীর ছোঁড়া, লাঠি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ ইত্যাদি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষণ চর্চা করেন আদিবাসী ভূমিজ ও মাহাতোরা। অস্ত্রবিদ্যাচর্চার একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ভিজাবিঁধা, ছেলকা, লাহল, তির-কাঁড়, ফরিখেলা প্রভৃতি অস্ত্রক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। লোকক্রীড়াতে উবু, থুকুম, বুড়ি, চোর প্রভৃতি শব্দগুলো বিভিন্নার্থে প্রয়োগের রীতি রয়েছে। লক্ষিত হয় দলবদ্ধ সংহত ভাবনা। এ ভাবনা যেমন পুরুষের খেলায় দেখা যায় তেমনি নারীদের খেলাতেও দেখা যায়। লোকক্রীড়ার মাধ্যমে জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

চ. লোকশিল্প

জঙ্গলমহলে লোকশিল্পের প্রাচুর্য রয়েছে। এর কারণ এখানে বনজ সম্পদ রয়েছে প্রচুর যা থেকে শিল্পসামগ্রীর উপাদান পাওয়া যায়। এইসব শিল্পসামগ্রীর নান্দনিক দিক যেমন রয়েছে তেমনি আছে ব্যবহারিক দিক। যুগযুগ ধরে লোকশিল্প হিসেবে পোড়ামাটির শিল্প, কাঁথাশিল্প, আলপনা, সরা, কুলো, মুখোশ, মোড়া, চুপড়ি, ধুনচি, তালপাতার পেঁখা প্রভৃতির চল আছে এই এলাকায়। গ্রামদেবতার আধিক্য থাকায় একশ্রেণির লোকশিল্প চর্চিত হয়। বিনপুর-১ ব্লকে পাথর খোদাই করে থালা বাটি, প্রদীপ, তাওয়া চাকতি, বেলুনি তৈরি করা হয়। ডোকরা কামারদের তৈরি পেতলের জিনিসপত্তর পুজোর সামগ্রী যেমন তেমনি নান্দনিক। পুরানো শাড়ির পাড় থেকে সুতো বের করে তাই দিয়ে সুচ ও সুতোর সাহায্যে নানারকমের লতাপাতা, ফুলগাছ পশুপাখি আঁকা হয় বা তৈরি করা হয় কাঁথার ওপর। তাছাড়া পুরানো পোশাক টুকরো টুকরো করে আসন বোনা হয়। আসনে সুন্দর করে লেখা হয় 'আসুন বসুন আসন গ্রহণ করুন।' জঙ্গলমহলে কাঠ ও পাতার প্রাচুর্য বলে এ দিয়ে নানা রকমের জিনিস শিল্পসামগ্রী হিসেবে তৈরি করা হয়। যেমন কলমিলতা দিয়ে খালুই (মাছ ধরে রাখার জিনিস), গোরুর মুখজালি প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য এফোঁড় -ওফোঁড় করে বোনা হয়। তালপাতা দিয়ে পাখা, পেঁখা, চাটাই, আসন, নানারকমের বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশ ও বনের গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে ঝুড়ি, পালি, চাল ধোওয়ার দ্রব্য, মুড়ি চালা তৈরি করা হয়। আদিবাসী ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ শালফুলের মালা গাঁথে। ব্রত অনুষ্ঠানে, দেবদেবীর পুজো উপলক্ষে, বিবাহ উপলক্ষে ছাদনাতলায়, বিয়ের পিঁড়িতে, বিয়েতে ব্যবহৃত কুলো, ভাঁড়ে, নববধূর আগমন উপলক্ষে আলপনা দেওয়া হয়। জঙ্গলমহলে ধর্মসম্পৃক্ত আলপনার প্রচলন দেখা যায় লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে। মাঠের পাকা ধানের শীষ দিয়ে চুলের বিনুনির মতো ধানের শীষের মালা গাঁথা হয়। এখানকার লোকশিল্পের নান্দনিক দিক ও ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনা ও অর্থনৈতিক চেতনার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ছ. লোকনৃত্য

সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, শবর, খেড়িয়া, ভূমিজ, বাগদি, বাউরি, ডোম, হাঁড়ি প্রভৃতি আদি জাতি-উপজাতির জীবনপ্রবাহে লোকগীতি ও লোকনৃত্যের প্রভাব অপরিসীম। অরণ্যচারী মানুষ নানারকম অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে তাদের ভাব প্রকাশ করতো। তা ই কালে কালে কোনভাবে নৃত্যের রূপ পেয়েছে। আবার, শ্রমের জন্য অঙ্গ-সঞ্চালন অনিবার্য। এই অঙ্গ-সঞ্চালনেই হয়তো নাচের জন্ম দেয়। এখানে যেসব লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি হোল ছো-নাচ, পাতা-নাচ, ঝুমুর নাচ, খেমটা নাচ, ভুয়াংনাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদি। এইসব নাচগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে গড়বেতা -১ নাম্বার ব্লকের সন্ধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বাঁশদা গ্রামের কাঠিনাচ বিখ্যাত। গড়বেতা-১ নাম্বার ব্লকের মোহনপুর, রাজবল্লভপুর, লোধা, জান্দা, মালবান্ধি, বলদঘাটা, কিশোরপুর, গড়বেড়িয়া, বৃকভানপুর সন্ধিপুর প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামের মানুষ বাঁশদার কাঠিনাচে, গানে, মাদলে, বাঁশির এবং নাচের মুর্ছনায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। নাচে কেবলমাত্র পুরুষরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণত লায়েক সম্প্রদায় এই নাচে অংশগ্রহণ করে। রোপন পদ্ধতিতে ধান চাষ যে করা হয় তা এখানকার নাচগুলির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠে। নৃত্যে নরনারীর অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের নৈকট্য পরিশেষে যৌনতাবোধকে তীব্র করে। শস্য ও সন্তান ছিল জনজাতির ক্রিয়াকলাপের মূল চালিকাশক্তি। অন্যান্য পার্থিব কামনাবাসনার সঙ্গে শস্যের সু-ফলন প্রাপ্তিও নৃত্যের এক লক্ষ্য।

অরণ্যকে বা বৃক্ষকে কেন্দ্র করে এখানে নাচের ব্যাপ্তি। যেমন, শালবৃক্ষের কচি কিশলয়ের আগমনে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রাচীন শালবৃক্ষের তলে সাঁওতালদের বৃক্ষপুজো ও নাচগান চলে। গ্রামের সাঁওতালদের বৃক্ষপুজো মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত হয় ওই গাছতলায়। গ্রামের সাঁওতালমাঝি বা মোড়ল সাঁওতালিভাষায় দেবতাকে পুজো দেয়। মহুল, মোরগ প্রভৃতি বলি প্রদত্ত হয়। পূজান্তে ওইখানে সকলে বসে পংক্তিভোজন করে। তারপর সারুল নাচে মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। মাদল ও ধামসার সঙ্গে তালে তালে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কুঁজো হয়ে নাচে। বিশ্বাস, এই জাতীয় নাচে গ্রামের অশুভ শক্তি পালিয়ে যায়। জীবন স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

জ. লোকচিকিৎসা

আদিম গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বনচারী মানুষ তার বিশ্বাস ও সংস্কারকে ভিত্তি করে প্রাকৃতিক সাহচর্যে নিজেদের মানসিক ও গোষ্ঠীগত রোগ সারানোর জন্য যেসব ওষুধ ব্যবহার করতো তার একটা লোকায়ত ধারা এখনও লোকসমাজ বহন করে চলেছে। দেশভেদে প্রাকৃতিক পরিবেশভেদে নানারোগের ওষুধ প্রয়োগ বিভিন্ন ধরনের হয়। এটি লোক পরম্পরা বাহিত, গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এবং গোষ্ঠীজীবনে পালিত হয়। এই ধরনের চিকিৎসা ও চিকিৎসার ওষুধ 'লোকচিকিৎসা' ও 'লোকৌষধ' বলে গণ্য। বংশ পরম্পরা একপ্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম, এক গোষ্ঠী থেকে আর গোষ্ঠীতে বহমান।

'জঙ্গলমহলের আদিবাসী ভূমিজ কুরমি ও অন্য গোষ্ঠীগুলির সমাজের সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। এখানকার জনজাতিগুলি কোন রোগে কী ব্যবহার করা হবে তা বংশানুক্রমে জেনে যায়। ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ। প্রাণিজ ওষুধও ব্যবহার করা হয়। এই অঞ্চলের লোকজীবনে ভেষজ উদ্ভিদ বা আয়ুর্বেদে বিশ্বাসের কারণ আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার অভাব। প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় কোনও চিকিৎসক এই এলাকায় গিয়ে থাকতে চান না। তাছাড়া দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করার জন্য আর্থিকভাবে অভাবী মানুষ হওয়ায় আধুনিক চিকিৎসাগ্রহণ করতেও পারে না।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোঁড়া, ভূমিজ, বীরহোড়, মাহালি, কুরমালি লোধা এবং শবরদের লোকচিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, ব্রতপূজার প্রচলন থাকলেও দ্রব্যগুণ সম্পন্ন ভেষজ ও প্রাণিজ ওষুধ প্রয়োগ সর্বজন বিদিত। বয়স্ক মানুষেরা এখনও টোটকা ওষুধেই বিশ্বাসী।

লোকচিকিৎসার প্রধান বিষয় হল দেহ সংরক্ষক লোকখাদ্য গ্রহণ, যা প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে লোকসমাজে বহুদিন ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। যে সময়কার যা খাবার তা সেই সময়েই খাওয়া উচিত। ছড়া ও প্রবাদের মাধ্যমে বলা হয়েছে — 'চৈতে গিমা তিতা, / বৈশাখে নালিতা মিঠা / জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল / আষাঢ়ে খই, শাওনে দই/ ভাদরে তালের পিঠা,/ আশ্বিনে শশা মিঠা, / কার্তিকে খলসের ঝোল / আগনে ওল/ পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল / ফাল্গুনে চূড়ান্ত বেল।'

লোকচিকিৎসা ও লোকৌষধ সম্পর্কে নানাবিধ বিবরণ, তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে পুঙক্ষানুপুঙক্ষভাবে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসাহিত্য

ক. ছড়া

প্রস্তাবিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির মধ্যে ছড়া, ধাঁধা প্রবাদ, ব্রতকথা, লোকপুরাণ লোকগীতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই অঞ্চলে ছড়াকে 'শ্লোক' বলা হয়। প্রচলিত ছড়াগুলিকে দু'টি শ্রেণিবিভাজন করে তাদের শাখাগুলিকে দেখানো হয়েছে। ছড়াগুলিতে সামাজিক রূপের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালসীমা পর্যন্ত। খেলাধুলো, সম্মিলিত কর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্র ছাড়াও বিভিন্ন উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে ছড়া বলা হয়।জঙ্গলমহলে শালপাতা ঝরাকে লক্ষ্য করে নিরক্ষর মানুষ এখনও বর্ষ গণনা করে থাকে। আদিবাসী সমাজ নির্দিষ্ট সময় শালগাছের বিয়ে দেয়। এই উৎসবকে 'বাহা পরব' বলে। তাছাড়া করম উৎসবকে কেন্দ্র করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে যেসব ছড়া প্রচলিত সেগুলিও বর্ষ পরিক্রমার অন্তর্গত। যেমন —

১. শালগাছে পাতা এল
পেটে পড়েনি ঘি
জাড় শেষে পাতা গেলে
খেতে হয় বিড়ি।

উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের মানুষ শীতকালেই ঘি খেতে চায়। শালগাছের পাতা মাঘমাসের দিকে ঝরে পড়ে। তারপর ফাল্গুন - চৈত্রে নতুন পাতা জন্মায়। কচি শালপাতায় মতিহার দিয়ে চুরুট খায় আদিবাসী ও কুরমি জনজাতির মানুষ যারা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে। তারা খড়ের আঁটিতে আগুন করে নিয়ে যায় মাঠে আর চাষবাসের কাজে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে চুরুট পাকিয়ে ধূমপান করে।

২. উবুথুবু গিরিসুতা
মায়ে বলে পড় ফুতা[১] [১]ফুতা = পুত্র, ছেলে।
পড়লে শুনলে দুদু[২] ভাতি[৩] [২]দুদু = দুধ, [৩]ভাতি = ভাত।
না পড়লে ঠ্যাঙালাঠি।

ছড়াটিতে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে অনেক ছড়া সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেগুলির সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ঘ. ধাঁধা

জঙ্গলমহলের লোকজীবনে ছড়ার মতো ধাঁধাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজীবী মানুষ কাজকর্মের শেষে পরিহাস রসিকতা ও অবসর বিনোদনের উপাদান হিসেবে ধাঁধাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে মনোযোগ, অধ্যবসায় ও অনেক বেশি ধীশক্তি

বাড়ানো যায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি ব্লকে যেসব ধাঁধা প্রচলিত আছে তা আমাদের সংহত সমাজের উপকরণ নিয়েই চর্চিত। এখানকার সিংহভাগ মানুষ কৃষিজীবী হওয়ায় ধাঁধাতে কৃষি সংক্রান্ত উপকরণ বেশি দেখা যায়। ধাঁধার মধ্য দিয়ে এখানকার মানুষের সমাজ-অর্থনীতি প্রসঙ্গ উল্লিখিত। ধাঁধাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছে এবং সেইসব শ্রেণিবিভাজনের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। যেমন - ১. সাতভাতারিসাবিত্রী

পাঁচ ভাতারি এয়ো
ভাই ভাতারির বিয়ে হবে
বাপ ভাতারির জা - ও।

(সাতভাতারি = স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ।
পাঁচভাতারি = দ্রৌপদী
ভাইভাতারি = সুভদ্রা, কৃষ্ণ ও বলরাম
বাপভাতারি = পৃথিবী)

ধাঁধাটি বলার সময় লোকজীবনে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগেও কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় না। বরং অশ্লীল শব্দপ্রয়োগ করতেও এখানকার লোকজীবন সাবলীল মানসিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত এই ধাঁধাতে পৌরাণিক প্রসঙ্গকে টেনে আনা হয়েছে। মহাভারতীয় কাহিনির পরিচয় যে লোকজীবনে ছড়িয়ে আছে তাও আমরা খুঁজে পাই।

সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোকজীবনে মানুষ প্রকৃতির বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ধাঁধার বিষয় নিবদ্ধ করেনি, পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেও ধাঁধাকে বেশি ব্যবহার করেছে। সেইসঙ্গে গ্রামীণ মানুষের সাংস্কৃতিক মানসটিও ফুটে উঠেছে —এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

গ. প্রবাদ

জাতির মনস্তত্ত্ব বা আচার-ব্যবহারে প্রবাদের যথেষ্টমূল্য আছে। এই এলাকার লোকসমাজ প্রবাদ না বলে 'শ্লোক আওড়ানো' বা 'শোলোক বলা' বলে। প্রবাদগুলিতে পারিবারিক জীবনকথা, অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এলাকাটি অরণ্যভূমি অধ্যুষিত হলেও কৃষিই প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। সেই কারণে মূলত কৃষি ও কৃষক পরিবার-এর জীবনকথা প্রবাদে ব্যক্ত। কিন্তু প্রবাদগুলিতে কৃষিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হলেও যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলে, যারা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সমগ্র মানব সমাজের অন্নসংস্থান করে সেই জনমজুরদের প্রতি অবজ্ঞার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রবাদে লুকিয়ে আছে। যেমন -

১. চাষি কী জানে কপ্পুরের[১] গুণ। ১কপ্পুর = কর্পূর
শুঁকে শুঁকে বলে সিন্ধুক নুন ।।

চাষির ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই। তার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ নেই, নেই রসাস্বাদন করার ক্ষমতা। তাই চাষির নিন্দার্থে করা হয়েছে প্রবাদটি।

ঘ. ব্রতকথা

ব্রত ঘরোয়া সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হয়। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলে অনুভূত হয় ভিন্ন বর্ণ, শ্রেণি ও কৌমবিন্যাস সমাজ থেকেই এর উৎপত্তি।

প্রস্তাবিত এলাকার মানুষ শিক্ষার আলো থেকে এক সময় বঞ্চিত ছিল। তাদের মনে প্রকৃতি-পরিবেশ সম্পর্কে ভয় আসে, বন-জঙ্গলের গভীরতা মনে ভীতি সঞ্চার করে। প্রকৃতি-পরিবেশকে কাজে লাগাবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে বাঁচার তাগিদে। বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা রুষ্ট দেবতাকে ভক্তিভাবে পুজো করে। সেই কারণে বোধহয় ব্রত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ব্রত এক ধরনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্রতপালন করা হয়। এখানকার ব্রতগুলিকে শ্রেণিবিভাজন করে বিভিন্ন ব্রত সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে অরন্ধন বা উনুনপুজো ব্রত পালিত হয়। কৃষিজীবী মানুষ বর্ষার চাষবাসের পর ১৫ই শ্রাবণের পর কিংবা ২২শে শ্রাবণের পর যে শুক্রবার পড়ে সেই শুক্রবার রাতে বহুরকমের ব্যঞ্জ তৈরি করে খাওয়া-দাওয়ার পর বাকি অংশ রেখে দেয়। পরের দিন 'খই ঢ্যারা' নামে পরিচিত। এইদিন খই, চালভাজা, বাদামভাজা, ছোলা, মটরভাজা ইত্যাদি শুকনো খাবার খেয়ে থাকে। শনিবার দিন ঘরে উনুন জ্বালানো হয় না। ওইদিন তুলসিমঞ্চের কাছে মনসা ডাল মাটিতে পুঁতে পুজো করা হয়। রাতে আগের দিনের বাসি ভাত খাওয়া হয়। কোনও কোনও বাড়িতে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতেও অরন্ধন পালনের ব্যবস্থা করা হয়।

অরন্ধন পালনের উদ্দেশ্য হোল বাড়ির সৌভাগ্য কামনা করা এবং সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া। শ্রাবণ মাসের ব্রতটিকে 'ঢ্যারা' ব্রত এবং ভাদ্র মাসের ব্রতটিকে 'রান্না পুজো' বা রান্না ব্রত বলা হয়। যেসব বাড়িতে ওইদিনদুটিতে কেউ মারা গেছে সেসব বাড়ি অরন্ধন পালন করা হয় না।

অরন্ধন ব্রত প্রকৃতপক্ষে কৃষিজীবী মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে জড়িত। বর্ষাকালীন চাষবাস শেষ করে কৃষক রমনীরা এই ব্রত পালন করে। তাছাড়া এইসময় সাপের ভয় বনাঞ্চলে খুব বেশি। তুলসিমূলে তাই মনসা পুজোও একইসঙ্গে করা হয়।

এলাকা থেকে প্রাপ্ত ব্রতগুলিতে ব্রতকথার সঙ্গে বিশ্বাস ও সংস্কারের যোগ রয়েছে। ব্রতকথার মাধ্যমে দেবমহিমা প্রচার, নারীজাতির সহ্যশক্তি, তাদের সেবাপরায়ণতার প্রকাশ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঙ. লোকপুরাণ

লোকপুরাণ লোকাচার ও লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে। লোকপুরাণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে সমসাময়িক সমাজনীতি-রীতি-আচার-আচরণ ও প্রতীকী ভাবনা। এই প্রতীকী ভাবনা উদঘাটন ছাড়া আদিম মননের পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকপুরাণের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের সত্য নিহিত আছে।

দেশের ভৌগোলিক পরিবেশে এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে লোকপুরাণের গল্পগুলির সৃষ্টি। জঙ্গলমহলের প্রস্তাবিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত যেসব লোকপুরাণ পাওয়া গেছে তারমধ্যে একটি হোল -

মাশরুম / খড়ছাতু / পোয়ালছাতু কীভাবে জন্মালো :

হিন্দুসমাজে বর্ণ হিন্দু বিধবাদের মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ। এবং সমাজে নিন্দনীয়। একবার এক বিধবার মাংস খাওয়ার লোভ হয়। কিছুতেই লোভ সংবরণ না করতে পেরে গোপনে রান্না মাংস খেতে থাকে। এমন সময় পরিচিত জন বাড়িতে চলে আসায় ওই বিধবা অপযশের ভয়ে তাড়াতাড়ি আধখাওয়া অবস্থায় মাংসভাত বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে ছাই পাঁশ গাদায় পুঁতে ফেলে ও পুরানো খড় চাপা দেয়। কিছুদিন পর সেখানে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে। সেই থেকে মাশরুম খেলে মাংসের মতো লাগে। খড়ছাতুর গায়ের রঙও মাংসের মতো লাল।

এই অঞ্চলের বর্ণহিন্দু বিধবারা পোয়ালছাতু বা খড়ছাতু খায় না। খড়ছাতু বা মাশরুমকে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষের মনে এই সংস্কারটি আজও পালিত। এখানকার লোকপুরাণগুলিকে সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। চেষ্টা করেছি যত বেশি লোকপুরাণ সংগ্রহ করা যায়। কারণ লোকপুরাণেই তো সভ্যতার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

চ. শিকার কাহিনি

জনজাতির মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে শিকার করতো। এখন এদের বংশধরেরা অন্যপেশায় নিযুক্ত হলেও শিকারের কাজে যুক্ত । এই এলাকার শিকার দৃশ্যের ফলক ও মন্দিরের গায়ে দেখা যায়।

প্রতিবছর ২রা বৈশাখ লোধা, শবর কুরমি সাঁওতাল মুণ্ডা ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ সারাদিন শিকার করে। আদিম মানুষ যেমনভাবে দলবদ্ধভাবে পশুপাখি শিকার করতো এদের কাজও ঠিক সেইরকম। আদিম শিকারজীবী মানুষ পশুশিকার করে আমোদ-প্রমোদ করতো তারই পুনরাবৃত্তি বর্তমানেও লক্ষিত হয়।

শিকার কাহিনিতে যেসব দুঃসাহসিকতা দেখা যায় তা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শিকারকাহিনির মটিফের সঙ্গে মিলে যায়। কয়েকটি শিকার কাহিনির উল্লেখ করা হয়েছে।

জঙ্গলমহলের বন্যপশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাঘ ও হাতিকে কুলদেবতারূপে পুজো করা হয়। ডোম, কেওট ও বাগদিদের পদবি বাঘ, বাগ। 'হাতি' পদবি তপশিলিজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। তপশিলি সমাজে সময়কুশলী ডোম, বাগদি, কেওটরা ঘোড়াকে তাদের কুলদেবতা মনে করে। এদের মধ্যে হাঁড়ি, কাঁড়রা প্রভৃতির কুলগত পদবি - ঘোড়া, ঘোড়ই। এসব তথ্য গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছ. লোকগীতি

এই এলাকাটিতে লোকসংগীতের বিষয়বস্তু কৌমবদ্ধ কৃষিভিত্তিক জীবনের ভাব-ভাবনার মধ্যেই আবর্তিত। এখানকার লোকজীবন সন্তান ও শস্যের মধ্যে কোনও প্রভেদ রাখেনি। তাই লোকসংগীতগুলি। যেমন প্রেম-ভালোবাসা তেমনি যৌনতা এবং প্রজননেরও। বিশেষভাবে ঝুমুর গানে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাৎসল্যের বিষয় বিধৃত।

এখানকার টুসু, ভাদু, ঝুমুর, করম, বাঁধনা প্রভৃতি লোকগানের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এমনকী রূপকও জনসাধারণের মনোরঞ্জনের কোনও প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না। লোকগানে ভাব ও ভাষা কালের প্রবাহে রূপান্তরণের মাধ্যমে নতুন অবয়ব গ্রহণ করলেও তার মূলসুরের কোনও পরিবর্তন হয় না।

এখানকার সমস্ত লোকগীতির সঙ্গে নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিয়ের গান ও টুসু গান ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত গানেই নৃত্য নির্ভর। নৃত্যের সঙ্গে সংগীতের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আদিম মানুষের জাদু বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম মানুষের লোকবিশ্বাসের ধারা অনুসরণ করে আজও এখানকার লোকসমাজে আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইঁদ, করম, বাঁধনা, জাওয়া, টুসু উৎসব পালন করে আসছে। বিভিন্ন লোকগীতিতে উঠে-আসা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও পর্যালোচিত।

পঞ্চম অধ্যায় : লোকভাষা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এই এলাকাটির ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক নানান বৈচিত্র্যের জন্য লোকভাষার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। জঙ্গলাকীর্ণ আদিবাসী মাহাত ভূমিজ অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ার কারণে এই এলাকাটির সঙ্গে মান্য চলিতের যোগ ছিল না। তবে গড়বেতা - ১ ব্লকের সঙ্গে হুগলি জেলা ও পূর্ব বাঁকুড়ার যোগ থাকায় এখানকার কথ্যভাষা মান্যচলিতের কাছাকাছি। শিক্ষার মান উন্নত না হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় এই কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নিদর্শন এখনও রক্ষিত — ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও শব্দগত দিক থেকে। যেমন - গোস্বামী > গোঁসাই >গুসাই; সিদ্ধ >সিজা ; সন্ধ্যা > সাঁজ/ সাঁঝ । এগুলি ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক। অন্যদিকে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল - মায়ে-ঝিয়ে শাগ তুলে (কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি)। পারাং লদীর থাকুন মাছ ধইরব। (অপাদান কারকে 'থাকুন' অনুসর্গ যোগ)। দমে আম ধইরেচে; গাছে আলু হঁইয়েছে। (বহুত্ববাচক অর্থে)। শব্দগঠনেও অনুরূপ - বেটা > বিটি ধুমসা>ধুমসি; মরদ > মাগি ; ছানা > মায়া (লিঙ্গান্তর)

যেসব জনজাতি এখানে বাস করে তাদের মধ্যে সাঁওতাল ও মুণ্ডা সম্প্রদায় দ্বিভাষিক। এরা মুণ্ডারি বংশের ভাষায় কথা বলে। আবার বাংলাভাষীদের সঙ্গে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে।

গড়বেতা -১ ও গড়বেতা -৩ ব্লক দু'টিতে মান্য চলিতের ব্যবহার রাঢ়ী উপভাষা অঞ্চলের লাগোয়া হুগলি জেলার পশ্চিম দিকও ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে যুক্ত। শালবনি ব্লকটি মেদিনীপুর জেলা শহরের কাছাকাছি হওয়ায় এই ব্লকের মানুষের উচ্চারণে শহরের প্রভাব পরিলক্ষিত।

এখানকার লোকভাষাতে ট্যাবুওয়ার্ড বা নিষিদ্ধ শব্দের ছড়াছড়ি। প্রয়োগগত দিক এগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। ১) সংস্কারমূলক ২) সৌজন্যমূলক ৩) গালিগালাজ / নিষিদ্ধ শব্দ । গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষের মুখেই অশ্লীল খিস্তি কোন্দলের সময়ও ধরা পড়ে। লোকভাষার নিষিদ্ধ শব্দগুলিকে শ্রেণিবিভাজন করে তার একটা তালিকা করা হয়েছে। এলাকায় প্রচলিত ছড়া প্রবাদ ধাঁধাতে এর প্রয়োগ দেখা যায়। প্রবাদ ও ছড়াতেও এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন - পঁদে নাই চাম / হরেকিষ্টের নাম।'

এই এলাকার প্রচলিত গালিগালাজে- নিষিদ্ধ শব্দ গুলি সাধারণত যৌন সম্পর্কিত। এরকম কিছু শব্দ - মা- মেগো, বাপ-ভাতারি, ভাই-ভাতারি, ঢ্যামনামাগি ইত্যাদি। সংস্কারমূলক নিষিদ্ধশব্দ যেমন - পুটুর মা, খকার বাপ ইত্যাদি।

বর্তমানেও এখানে ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি প্রভৃতি শব্দের প্রচলন রয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ি বা বড়োদের নাম না বলে তার বদলে অন্য কোনও শব্দপ্রয়োগ করে লোকসমাজ। মানসিক বিশ্বাস ও সংস্কার বশে রাতের বেলা সাপ না বলে লতা বলে। ভাত বা চাল না থাকলে 'ভাত বাড়ন্ত' বা 'চালবাড়ন্ত' বলার সুভাষণ রীতি প্রয়োগ লক্ষিত হয়। অন্যদিকে গুয়া, মেথরা ঢ্যালা প্রভৃতি নামকরণের ফলে কুভাষণ রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। লোকসমাজের মনস্তত্ব যেমন ক্রিয়াশীল তেমনি শিষ্টাচার, সৌজন্য ও পারিবারিক বিধি নিষেধ ও মান্য করা হয়। লোকভাষা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : শেষকথা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাঁচটি ব্লকের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ পরিস্ফুটনের স্বকীয়তা প্রকাশে চেষ্টা করেছি। বর্তমানে শিক্ষারআলো পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকমানসের পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। কঠোর জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যের মুখ দেখলেও বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। টিভি-কালচার ও কিছু মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে জনজাতিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পটচিত্র বিবর্তিত হচ্ছে। কঠোর জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে এদের টিকে থাকার কাহিনি সাহিত্য চর্চার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় এদের সাহিত্য চর্চাও পরিবর্তিত । টুসু গানে, ঝুমুর গানে, প্রবাদে, ছড়ায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। আধুনিক জীবনযাত্রার স্পর্শে ধর্মীয় ও লোকবিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে। লোকমানসে পরিলক্ষিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চেতনা। সমাজজীবনের পরিবর্তনের ধারায় লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির মানচিত্র বদলাচ্ছে। যৌথপরিবার ভাঙনের ফলে লোকমানসের বদল ঘটে যাচ্ছে। ঠাকুমা জেঠিমার মুখে মুখে লোককথা, ছড়া আর সেভাবে শোনা যাচ্ছেনা। ভাষাভঙ্গীও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে মান্যচলিতের বৈশিষ্ট্য স্বীকরণ করছে। বলা যায়, ভাষা-সংস্কৃতি— সব দিক থেকেই এই অঞ্চলটির যুগসন্ধিক্ষণ চলছে।

সহায়ক বই

১। অচিন্ত্য বিশ্বাস- লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, ২০০৮
২। অতুল সুর- বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়- জানুয়ারি, ১৯৮৬
৩। অতুল সুর- হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক কাব্য (২য়), ১৯৭৪
৪। অতুল সুর- ভারতে বিবাহের ইতিহাস, ১৩৮১
৫। অনিমেষকান্তি পাল- লোকসংস্কৃতি, ২০০০
৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর- বাংলার ব্রত, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
৭। অসীম দাস- বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস, ১৯৯১
৮। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তি (১২ তম সংস্করণ), ১৯৯২
৯। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সংস্করণ), ১৯৫৮
১০। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলার লোকসাহিত্য (আলোচনা), ১ম খণ্ড, ১৯৬২
১১। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলার লোকসাহিত্য (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)
১২। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য- বাংলার লোকশ্রুতি, শ্রাবণ-১৩৯২
১৩। আলি নওয়াজ- খনার বচন কৃষি ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি-১৩৯৬
১৪। আশিস বসু- পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা, ১৯৬২
১৫। আশিস্ কুমার দে ও সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত)- লোকভাষা
১৬। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী- বাংলার স্ত্রী আচার (সংকলিত) ১৩৬৩
১৭। ওয়াকিল আহমদ- বাংলার লোকসংস্কৃতি, ১৯৭৪
১৮। কাজী দীন মহম্মদ-লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ, ১৯৬৮
১৯। কামিনীকুমার রায়- হিন্দু বিবাহে লোকাচার, ১৯৮০
২০। কৃষ্ণানন্দ দে- লোককান্ত মেদিনীপুর (২য়), ১৯৮৫
২১। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু- বাংলার লৌকিক দেবতা (২য়), ১৯৮৭
২২। চিত্তরঞ্জন মাইতি- বাংলা লোকসংগীতে লোকজগৎ ও লোকমানস
২৩। জয়শ্রী ভট্টাচার্য- বাংলা প্রবাদে নারীমন, কলকাতা, ১৯৯১
২৪। তপন কর- অসামান্য মানভূম, ১৯৯৪
২৪। তরুণদেব ভট্টাচার্য- পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, মেদিনীপুর, ২০০৯
২৫। তারাপদ সাঁতরা- মেদিনীপুর: সংস্কৃতি ও মানব সমাজ, ১৯৮৭
২৬। তারাপদ সাঁতরা- পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর, ১৯৮৮
২৭। তারাপদ সাঁতরা- পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, ডিসেম্বর ২০০০
২৮। তারাশংকর ভট্টাচার্য- বৃহত্তর গড়বেতার ইতিহাস, ১৯৮২
২৯। তুষার চট্টোপাধ্যায়- লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান (২য় সংস্করণ) ১৪০১
৩০। ত্রিপুরা বসু- লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত, ১৯৮৯
৩১। দিব্যজ্যোতি মজুমদার- লোককথার ঐতিহ্য, ১৯৮৬
৩২। দিব্যজ্যোতি মজুমদার- আদিবাসী লোককথা, ২০০৭
৩৯। দিব্যজ্যোতি মজুমদার- বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, ২০০০
২২। দিব্যজ্যোতি মজুমদার- লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকায়ত মন, ২০১০
৩৩। দীনেন্দ্রকুমার সরকার (সম্পাদিত)- বিবাহের লোকাচার, ১৯৬৯
৩৪। দুলাল চৌধুরী- বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৭৬
৩৫। দুলাল চৌধুরী- বাংলার লোক উৎসব, ১৯৮৭
৩৬। দুলাল চৌধুরী- বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাস, ১৯৯০
৩৭। দুলাল চৌধুরী- লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি, ১৯৯০
৩৮। দেবতুষি মিশ্র- লোকসংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ, ২০১০
৩৯। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ও সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)- লোকসংস্কৃতি, ১৯৯৫
৪০। নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়- ঝুমুর, ১৯৯৬
৪১। নির্মলেন্দু ভৌমিক- বাংলা ধাঁধার ভূমিকা, ১৯৮৮
৪২। নীহাররঞ্জন রায়- বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) নিরক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৮০
৪৩। পবিত্র সরকার- লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, ১৯৯১
৪৪। পল্লব সেনগুপ্ত- লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ২০০২
৪৫। পশুপতি প্রসাদ মাহাত- ঝাড়খণ্ডের হড়মিতান : সামাজিক সভ্যতা শিল্পচেতনা ও জীবনবোধ, ২০০১
৪৬। ড. প্রদ্যোৎকুমার মাইতি- মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, ২০০১
৪৭। প্রদ্যোৎকুমার মাইতি- বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, ২০০০
৪৮। পূর্ণচন্দ্র দাস- কাঁথির লোকাচার, ১৯৫৮
৪৯। বরুণকুমার চক্রবর্তী- বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, ১৯৮৮- ১৯৯০

৫০। বরুণকুমার চক্রবর্তী- লোকসংস্কৃতি : নানাপ্রসঙ্গ, ১৯৮২
৫১। বরুণকুমার চক্রবর্তী- লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার
৫২। বরুণকুমার চক্রবর্তী-লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ, ১৯৮৪
৫৩। বরুণকুমার চক্রবর্তী- প্রসঙ্গ: লোকপুরাণ, ১৯৯১
৫৪। বরুণকুমার চক্রবর্তী- বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র
৫৫। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি- মেদিনীপুরের স্থান এবং, ২০০২
৫৬। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত- ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ২০০০
৫৭। বিনয় মাহাত- লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ১৯৮৪
৫৮। বিনয় ঘোষ- পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ), ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮৬
৫৯। বিনয় ঘোষ- বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, ১৪০৬
৬০। ভবতারণ দত্ত- (সম্পাদিত)- বাংলার ছড়া, ১৯৯৭
৬১। ভাস্করব্রত পতি- হটেশ্বরের গাজন, ২০০৯
৬২। মহাশ্বেতা দেবী (অনূদিত)- রামানুজ এ. কে. রচিত ভারতের লোককথা, ২০০৫
৬৩। মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি- রূপে অরূপে বাংলা ২০০৫
৬৪। মনহারুল ইসলাম- ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ১৯৯৩
৬৫। মদনচন্দ্র করণ- প্রবাদের স্বরূপ ও মীমাংসা: বাঙালীর পারিবারিক জীবন, ২০০৩
৬৬। মধুসূদন দত্ত- মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬০
৬৭। মৃত্যুঞ্জয় গুঁই- প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস
৬৮। মানস মজুমদার- লোকঐতিহ্য চর্চা-২০১০
৬৯। মিহির চৌধুরী কামিল্যা- রাঢ়ের গ্রামদেবতা, ১৯৮৯
৭০। মোমেন চৌধুরী- বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ, ১৯৯৮
৭১। যোগীন্দ্রনাথ সরকার- খুকুমণির ছড়া, ২০০৪
৭২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- লোকসাহিত্য, ১৯০৭
৭৩। শক্তি সেনগুপ্ত (সম্পাদিত)- লোকায়ত মানভূম, ১৪০৭
৭৪। শংকর সেনগুপ্ত- বাঙালির খেলাধূলা, ১৯৭৬
৭৫। শীলা বসাক- বাংলার ব্রত পার্বণ, ১৯৯৮
৭৬। শীলা বসাক- বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, ১৯৯৮
৭৭। সনৎকুমার মিত্র-পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য, ১৯৮৫
৭৮। সত্রাজিৎ গোস্বামী- বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ
৭৯। সুধীরকুমার করণ- সীমান্ত বাংলার লোকযান, ১৩৭১
৮০। সুনীল চক্রবর্তী- লোকায়ত বাংলা, ১৯৬৯
৮১। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়- পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, ১৯৬৯
৮২। সুশীলকুমার দে- বাংলা প্রবাদ, ১৯৮৫
৮৩। সৌমেন সেন- লোকসংস্কৃতির আত্ম-অপর ও অন্যান্য, ২০০৪
৮৪। হরিসাধন দাস- মেদিনীপুর ও স্বাধীনতা (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইতিকথা), ২০০১
৮৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়- বৈষ্ণব পদাবলী (সম্পাদিত)

1. Acher Taylor : SDFML edited by Maria Leach, New York, 1984
2. Chanchal Kumar Chatterjee- Studies in the Rites and Rituals of Hindu Marriage in Ancient India, 1978
3. Edward Westermarck- The History of Human Marriage-Vol. II, 1921
4. Franz Boas- Anthropology and Moder Life.
5. H. Margan- Ancient Society
6. H.H. Risley- Tribes and Castes of Bengal, 1891
7. James Frejar- The Golden Bough
9. Krishanapada Goswamy, Placenames of Bengal
10. L.S.S.O. Malley- Bengal District Gazetters, Midnapore 1911
11. Manser H. Martin- Proverbs, New Delhi, 2005
12. P.K. Bhowmik- The Cattle Caressing, 1957
13. S.K. Chatterjee- Occultism in Fringe Bengal, 1978
14. S.K. Chatterjee- The Origin and Developement of Bengali Language- Part-I, 1986

অন্যান্য: ১। ডাক ও খনার বচন থেকে গৃহীত তথ্য।
২। মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, সৃজন, ২০১১

Others:
1. District Statiscal Hand Book- Midnapore-2011, Govt. of West Bengal.
2. Census Report-2001